বিধবা বিবাহের দেড়শো বছর

দেবব্রত বিশ্বাস

সেই সময় ভারতে নারী নির্যাতনের অন্যতম অঙ্গ ছিল সতীদাহ প্রথা। আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের সময় (৩২৭ খৃঃ পূঃ) গ্রীকরা এদেশে এই অমানবিক আচরণ দেখেন। মুসলমান শাসকরা সতীদাহ অপছন্দ করলেও হিন্দুধর্মীয় ভাবনায় আঘাত করেননি। ইংরেজ শাসনকালে কাপ্তেন টমিন, জে. আর. এলফিনস্টোন, লর্ড ওয়েলেসলি, হুগলীর ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ অকলে প্রমুখেরা সতীদাহ প্রথা রদের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। রামমোহন রায়ের চেষ্টায় ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক এই প্রথা আইনবিরুদ্ধ করেন। সেই সময় আধুনিক শিক্ষা পেয়ে কলকাতার শিক্ষিত যুবকদের একাংশের মধ্যে প্রগতিশীল ভাবনা বিকশিত হয়ে উঠেছিল। শাসকশক্তি নিজ স্বার্থে গড়ে তুলেছিল স্কুল কলেজ ইত্যাদি। তার সুফল লাভ করলো এদেশের ছাত্রসমাজ। কুপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুললেন তাদের একাংশ এবং কতিপয় উন্নত চিন্তার অধিকারীরা।

সহমরণ প্রথার গ্রাস থেকে রক্ষা পেলেও বৈধব্যের দহন থেকে মুক্তি মেলেনি মেয়েদের। বল্লাল সেনের আমলে বিকশিত কৌলীন্য প্রথার কবলে পড়ে হাজার হাজার মেয়ের সর্বনাশ হয়। কুলীনরা পুণ্য সঞ্চয়ের লোভে অতিবৃদ্ধের সাথেও কোলের মেয়েকে বিয়ে দিতে কুণ্ঠিত হতো না। আর কুলীন স্বামীর স্ত্রীর সংখ্যা ও তাদের পরিচয় মনে করতে খাতা সঙ্গে রাখতেন। ফলে এক কুলীনের মৃত্যুতে অগুন্তি মেয়ের জীবনে নেমে আসতো বৈধব্যের অভিশাপ। অনাহার, অর্ধাহার আর অবহেলায় নিঃশেষিত হতেন তারা।

বিদ্যাসাগরের আগে বিধবা বিবাহের উদ্যোগ

ঢাকার জমিদার রাজবল্লভ সেন (১৬৯৮-১৭৬৩) তাঁর আট বছরের বিধবা মেয়ে অভয়ার বিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। যেহেতু হিন্দুসমাজে এই বিবাহ হতো না তাই তিনি শাস্ত্রের সহযোগিতা পেতে সচেষ্ট হন। তাঁর নির্দেশে কৃষ্ণদাস বেদান্তবাগীশ, কৃষ্ণদেব বিদ্যাবাগীশ, নীলকণ্ঠ সার্বভৌম বিধবা বিবাহের পক্ষে শাস্ত্রীয় বচন অনুসন্ধান করে জানান যে অক্ষতযোনি বিধবাদের পুনরায় বিবাহে হিন্দুশাস্ত্রে বাধা নেই। কাশী, কাঞ্চী, নিথিলার পণ্ডিতরাও সমর্থন জানায়। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের (১৭১০-১৭৮৩) চক্রান্তে নবদ্বীপের পণ্ডিতরা বিধবা বিবাহের বিরোধিতা করে রাজবল্লভের লক্ষ্যকে ভেস্তে দেন। কোটার রাজা বিধবা বিবাহের প্রচলন করতে চেয়েছিলেন। রামমোহন রায়ের, আত্মীয় সভার (১৮১৫) বৈঠকে বাল্যবিবাহ নিয়ে গভীর আলোচনা হতো। ডিরোজিও ও তাঁর শিষ্যরা অ্যাকাডেমির অ্যাসোসিয়েশনের বৈঠকে গোঁড়া হিন্দুত্বের বিরোধিতা করতেন। ইয়ং বেঙ্গলদের মুখপত্র বেঙ্গল স্পেকটেটর পত্রিকায় বিধবাদের পুনরায় বিবাহের পক্ষে লেখালেখি হয়। ভারতীয় ল কমিশনের সেক্রেটারি জে. পি. গ্রান্ট ১৮৭৩ সালের ৩০শে জুন এই বিষয়ে অন্যান্য বিচারপতিদের মতামত চেয়ে পত্র লেখেন। হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহের বিষয়ে কলকাতা সদর আদালতের রেজিস্টার আর. ম্যাকান এলাহাবাদ সদর আদালতের রেজিস্টার এইচ. বি. হ্যারিংটন, ফোর্ট সেন্ট জর্জের সদর আদালতের রেজিসার ডবলিউ. ডগলাস হিন্দুদের সাবেকী প্রথার উপর হস্তক্ষেপ করতে নিষেধ করেন। বাংলা ভাষায় প্রথম অভিধান সঙ্কলক, ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সম্পাদক এবং সংস্কৃত কলেজের স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ (১৭৮৬-১৮৪৫) বিধবা বিবাহের সপক্ষে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। মতিলাল শীল (১৭৯২-১৮৫৪) প্রথম বিধবা বিবাহকারীকে বিশ হাজার টাকা পুরস্কার দেবেন বলে ঘোষণা করেন। কলকাতার বহুবাজারের নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়, পটলডাঙার শ্যামাচরণ দাস কর্মকার বিধবা বিবাহ দিতে উদ্যোগী হয়ে ব্যর্থ হন। কৃষ্ণনগরের রাজা শ্রীশচন্দ্র বিধবা বিবাহের বিষয়ে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের নিয়ে বিচার বিবেচনা করেন। বারাসাতের কালীকৃষ্ণ মিত্র, ব্রজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সভা সমিতির আয়োজন করেন উক্ত বিষয় অবলম্বন করে।

বিধবা বিবাহ প্রচলনে উদ্যোগী বিদ্যাসাগর

ছোটোবেলা থেকেই বিধবা মেয়েদের যন্ত্রণাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)। বীরসিংহ গ্রামে তাঁর এক পরিচিত মেয়ে বিধবা হয় অল্প বয়সে। তিনি তখন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। গ্রামে ছুটিতে এসে সেই মেয়েটিক বৈধব্য যন্ত্রণা দেখে সঙ্কল্প করেন এই দুঃখ তিনি ঘোচাবেন। ১৮৫০ সালের আগস্ট মাসে সর্বশুভকরী পত্রিকায় লেখেন 'বাল্যবিবাহের দোষ' নামক প্রবন্ধ। সেখানে তিনি বিধবা বিধবা বিবাহের পক্ষে তীক্ষ্ম ভাষায় বক্তব্য রাখেন। সমাজপতিরা বিরোধিতা শুরু করলেন। এমনকি তাঁর শিক্ষাগুরু শম্ভুচন্দ্র বাচস্পতির সাথেও আদর্শগত সংঘাত আরম্ভ হয় বিদ্যাসাগরের। ১৮৫০ সালের ডিসেম্বরে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক পদে যোগ দিয়ে অল্পকালের মধ্যেই অধ্যক্ষ হন। চরম ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারে দিনরাতে সময় সুযোগ পেলেই বিধবা বিবাহের পক্ষে শাস্ত্রীয় যুক্তি খুঁজতেন। ধর্মভীরু সমাজকে স্বমতে আনার জন্য শাস্ত্র সমর্থন জরুরী ছিল। সমাজের রীতিনীতি স্থির হতো শাস্ত্রীয় বচন দ্বারা। তাই শাস্ত্রীয় বিধানকে ভাঙতে শাস্ত্রেরই যুক্তি জোগাড় করেছিলেন বিদ্যাসাগর।

বিদ্যাসাগরের বই প্রকাশ : বিধবা বিবাহ বিষয়ক

১৮৫৫ সালের জানুয়ারিতে 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' পুস্তিকাটি প্রকাশ করলেন বিদ্যাসাগর। ১৭৭৬ শকাব্দের ফাল্গুন মাসে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় উপরোক্ত লেখটিকে বড়ো প্রবন্ধাকারে পূর্বেই প্রকাশ করেছিলেন। গ্রন্থটি প্রকাশের অল্প সময়েই ১৫ হাজার কপি বিক্রি হয়ে যায়। এটিতে বিধবা বিবাহের পক্ষে অসংখ্য তথ্য প্রমাণ

উদ্ধৃত করেছেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ভরতচন্দ্র শিরোমণি ভট্টাচার্য্য, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন এবং ছাত্র রামকমল ভট্টাচার্য্য, রামগতি ন্যায়রত্ন তথ্য সংগ্রহের কাজে বিদ্যাসাগরকে সহায়তা করেন। রচনাটির শেষ পর্বে লেখেন 'দুর্ভাগ্যক্রমে, বাল্যকালে যাহারা বিধবা হইয়া থাকে, তাহার যাবজ্জীবন যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে, তাহা যাঁহাদের কন্যা, ভগিনী, পুত্রবধু প্রভৃতি অল্পবয়সে বিধবা হইয়াছেন, তাঁহারা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছেন। কত শত বিধবারা, ব্রহ্মচর্য নির্বাহে অসমর্থ হইয়া, ব্যভিচারদোষে দূষিত ও ভ্রূণহত্যা পাপে লিপ্ত হইতেছে; এবং পতিকুল, পিতৃকুল ও মাতৃকুল কলঙ্কিত করিতেছে। বিধবাবিবাহের প্রথা প্রচলিত হইলে, অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণা, ব্যাভিচারদোষ ও ভ্রূণহত্যা পাপের নিবারণ ও তিন কুলের কলঙ্ক নিবাকরণ হইতে পারে। যাবৎ এই শুভঙ্কের প্রথা প্রচলিত না হইবেক, তাবৎ ব্যাভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যা পাপের স্রোত, কলঙ্কের প্রবাহ ও বৈধব্য যন্ত্রণার অনল উত্তরোত্তর প্রবল হইতেই থাকিবেক।'

১৯৫৫ সালের অক্টোবরে আরেকটি বই প্রকাশ করেন। নামকরণ হয় 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইয়া উচিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব, দ্বিতীয় পুস্তক।' প্রথমটির চেয়ে আকারে বড়ো। বই দুটো প্রকাশিত ও প্রচারিত হবার পর সমাজের ব্যাপক আলোড়ন উপস্থিত হয়। সংবাদপত্র ও সভাসমিতি মুখর হয়ে ওঠে। পক্ষে বিপক্ষে জনমত সংগঠিত হয়।

বিদ্যাসাগরের পক্ষে বিপক্ষে জনমত গঠন

১৯৫৪ সালের ১৫ই ডিসেম্বর কলকাতার কাশীপুরে কিশোরীচাঁদ মিত্রের বাড়িতে সমাজোন্নতি বিধায়িনী সুহৃদ সমিতি গঠিত হয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সভাপতিত্বে। এই সমিতির অধিকাংশই বিদ্যাসাগরকে সমর্থন করেন। তত্ত্ববোধিনী, সমাচার সুধাবর্ষণ প্রভৃতি পত্রিকাও পক্ষে মত প্রচার করে। রাধাকান্তদেব (১৯৮৩-১৮৬৭) প্রথমে বিদ্যাসাগরের মতকে স্বীকৃতি দিলেও পরবর্তীতে অন্য সমাজপতিদের চাপে বিধবা বিবাহের বিপক্ষে আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করেন। শহরের আঙিনা ছাড়িয়ে আন্দোলনের ঢেউ পৌঁছালো গ্রামগঞ্জেও। সংবাদ প্রভাকর এবং তার সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত বিপক্ষে লেখেন। দীনবন্ধু মিত্র, দাশরথি রায় লিখেছেন এই বিষয়কে ঘিরে। প্রতিবাদীরা কয়েকটি বইও প্রকাশ করে।

আইনের আওতায়

জনতার মধ্যে আলোড়ন ওঠার পর বিদ্যাসাগর আইন প্রণয়নের জন্য উদ্যোগী হলেন। ১৮৫৫ সালের ৪ঠা অক্টোবর ৯৮৬ জনের সই সহ একটি আবেদনপত্র পাঠালেন ব্যবস্থাপক সভায়। ১৮৫৫ সালের ১৭ই নভেম্বর আইনের পাণ্ডুলিপিটি লেজিসলেটিভ কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া বা ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রথম পড়া হয়। জি.পি. গ্রান্ট প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন এবং স্যার জেমস কলভিল সমর্থন করেন। ১৮৫৬ সালের ৯ই জানুয়ারি পুনরায় খসড়াটি উত্থাপিত হয় সভায়। তারপর এটি চলে যায় সিলেক্ট কমিটির হাতে। স্যার জেমস কলভিল, এলিয়ট, পি ডব্লু, লিগেট, জে.পি. গ্রান্ট ছিলেন এই কমিটিতে। ১৮৫৬ সালের ১৭ই মার্চ প্রায় ৩৩ হাজার লোকের সই সহ একটি বিধবা বিবাহ বিরোধী আবেদনপত্র পাঠালেন রাধাকান্তদেব। সর্বমোট প্রায় ৫ হাজার লোক পক্ষে এবং ৫০/৬০ হাজার লোক বিপক্ষে স্বাক্ষর পাঠায় ব্যবস্থাপক সভায়। ১৮৫৬ সালের ৩১শে মে সিলেক্ট কমিটি রিপোর্ট জমা দেয়। ১৯শে জুলাই তৃতীয়বারের জন্য পাণ্ডুলিপিটি পরীক্ষা করে দেখার পর আইন পাস হয়ে যায়। ১৮৫৬ সালের ১৬ই জুলাই আইন বিধিবদ্ধ হয় এবং ২৬শে জুলাই আইনটি কার্যকর হয়।

প্রথম বিধবা বিবাহ

আইন পাসের পরে বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ দিতে তৎপর হলেন। পাত্র খাটুয়ার বিখ্যাত কথক রামধন তর্কবাগীশের ছেলে শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক এবং বিয়ের সময় মুর্শিদাবাদের জজ হন। পাত্রী বর্ধমানের পালসে ডাঙার ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং লক্ষ্মীমণি দেবীর দশ বছরের বাল্যবিধবা কালীমতী, বারো নম্বর সুকিয়া স্ট্রিটে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে বসে বিয়ের আসর। দিনটি ছিলো ১৮৫৬ সালের ৭ই ডিসেম্বর। নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রামপ্রসাদ রায়, দিগম্বর মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, নৃসিংহচন্দ্র বসু, কালীপ্রসন্ন সিংহ, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, ভারতচন্দ্র শিরোমণিণ, প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ, তারানাথ তর্কবাচস্পতি প্রমুখেরা সেই বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ প্রভাকর, সম্বাদ ভাস্কর, হিন্দু পেট্রিয়ট, তত্ত্ববোধিনী প্রভৃতি পত্রিকায় সংবাদটি গুরুত্ব সহকারে বেরোয়। কলকাতায় প্রথম বিধবা বিবাহের পরদিন পানিহাটি গ্রামের কুলীন কায়স্থ বংশের হরকালী ঘোষের ভাই কৃষ্ণকালী ঘোষের ছেলে মধুসূদন ঘোষের সাথে কলকাতার নিমাইচরণ মিত্রের পৌত্র ঈশানচন্দ্র মিত্রের বারো বছরের বিধবা মেয়ের বিয়ে হয়। মেয়েটির বাবাই সম্প্রদান করেন। সমাজে বিধবা বিবাহের প্রচলন হয়ে গেলো। বিদাসাগরের একমাত্র ছেলে নারায়ণচন্দ্র ১২৭৭ সনের ২৭ শ্রাবণ খানাকুল কৃষ্ণনগরের বাসিন্দা শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিধবা মেয়ে ভবসুন্দরীকে বিবাহ করেন।

বিধবা বিবাহ ঘিরে আলোড়ন

ধনী গরিব শিক্ষিত মুর্খ ছেলে মেয়ে যুবক বৃদ্ধ সকল মানুষের আলোচনার বিষয় হয়ে উঠলো বিধবা বিবাহ, ছড়া গানের ঢল নামে একে ঘিরে। শান্তিপুরের তাঁতিরা 'বিদ্যাসাগর পেড়ে' নামের শাড়ি তৈরি করে, যার পাড়ে লেখা থাকত 'সুখে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে। সদরে করেছে রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে।' কবি ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর শাণিত কলমে লিখলেন বহু কবিতা, যার অন্যতম একটি হলো 'বাধিয়াছে দলাদলি লাগিয়াছে গোল। বিধবার বিয়ে হবে বাজিয়াছে ঢোল।' পিছিয়ে ছিলেন না দাশরথি রাও। লিখলেন, 'তোমরা এই ঈশ্বরের দোষ ঘাটবে কিরূপে? রাখিতে ঈশ্বরের মত, হইয়ে ঈশ্বরের দূত, এসেছেন ঈশ্বর বিদ্যাসাগর রূপে।' বহু পণ্ডিত বিধবা বিবাহের বিরোধিতা করেন। বই পুস্তিকা লেখেন। সেকালের অনেক

পণ্ডিত যেমন উমাকান্ত তর্কালঙ্কর, শ্যামাপদ ন্যায়ভূষণ, শশীজীবন তর্করত্ন, জানকীজীবন ন্যায়রত্ন, কালিদাস মৈত্র, সর্বানন্দ ব্যায়বাগীশ, রামচন্দ্র মৈত্রেয়, প্রসন্নকুমার মুখোপাধ্যায়, নন্দমুর কবিরত্ন প্রমুখ বিধবাবিবাহের প্রতিবাদ করেন। সারা দেশে হৈ চৈ পড়ে যায়। হিন্দু পেট্রিয়ট, তত্ত্ববোধিনী, সংবাদ প্রভাকর, সমাচার সুধাবর্ষণ, সম্বাদ ভাস্কর প্রভৃতি পত্রিকায় অজস্র লেখালেখি হয়। সরকারের কাছে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পক্ষে বিপক্ষে আবেদন জড়ো হয়েছিল। রাধাকান্ত দেবের বিধবা বিবাহের বিরোধি সব আবেদনের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। ত্রিপুরা থেকে ৩২০ জন বিপক্ষে আবেদন করেন। ১৮৫৬ সালের ২৫ মার্চ বোম্বাইয়ের সাতরা থেকে ১৪১ জন বিপক্ষে চিঠি পাঠায়। ২৪৮ জনের সই করা বিপক্ষের আবেদন আসে বোম্বাইয়ের কসবা কল্যাণ অঞ্চল থেকে। পুনা থেকেও অনেকে। শ্রীশচন্দ্র রায়বাহাদুর, কলাকাতা মিশনারি কনফারেনসের সদস্যরা, ভিঞ্চুরের মারাঠা প্রধান, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, রাজনারায়ণ বসু, ভগবানচন্দ্র বসু, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কিশোরীচাঁদ মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার প্রমুখেরা বিলের পক্ষে আবেদন পাঠিয়ে ছিলেন। বারাসাত, হালিশহর, বেলঘরিয়া, মহেশ্বরপুর, কলকাতা, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, ময়মনসিংহ, ঢাকা থেকে অসংখ্য জন আইনের পক্ষে আবেদন করেন।

আইন পাশের পরও লেখালেখি কম হয়নি, জনতার উত্তেজনাও বহাল ছিল। ঈশ্বর গুপ্ত হতাশায় লিখলেন 'করিছে আমার ধর্ম্ম আমাতে নির্ভর। রাজা হয়ে পরধর্ম্মে একেন দেন কর।' সমগ্র দেশেই হিন্দু বিধবার বিয়ে প্রচলন হয়। সম্বাদ ভাস্কর, ফ্রেন্ড অব ইন্ডিয়া, ইংলিশম্যান, হিন্দু পোট্রিয়ট প্রভৃতির সংবাদ থেকে বিস্তারিত জানা যায়। বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে ঘিরে কবিতা, নাটক লেখা হয়। দাশরথি রায়, ঈশ্বর গুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মানকুমারী বসু, রজনীনাথ চট্টোপাধ্যায় আন্দোলনের পক্ষে অথবা বিপক্ষে কবিতা লিখেছেন। বামাবোধিনী, বান্ধব, আর্যদর্শন, অনুসন্ধান পত্রিকায় বিধবা প্রসঙ্গে একাধিক কবিতা আছে। বাংলা নাটককেও বিষয় রূপে বিধবা বিবাহকে গ্রহণ করা হয়। রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুল সর্বস্ব', উমাচরণ মনোরঞ্জন' উল্লেখ্য। শিমুয়েল পিরবক্সের 'বিধবা বিবাহ', যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়র 'চপলা চিত্ত চাপল্য', হরিশচন্দ্র মিত্রের 'শুভস্য শীঘ্রং', যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'বিধবা বিলাস', বিরাটমোহন চৌধুরীর 'বঙ্গবিধবা' আন্দোলনের পক্ষে লেখা। আবার অমৃতলাল বসুর 'বাবু', গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'বিধবার দাঁতে মিশি' নাটকগুলি বিধবা বিবাহের বিপক্ষে লেখা হয়। সমাজজীবনের সর্বত্রই এবং সাহিত্যেও সেই সময় গভীর প্রভাব ফেলে বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গটি।

প্রথম বিবাহ বিবাহের পরবর্তী সময়

প্রথম বিধবা বিবাহের কিছুদিন বাদে রাজনারায়ণ বসুর ভাই দুর্গানারায়ণ বসু ও মদনমোহন বসু বিধবা বিবাহ করেন। মেদিনীপুরে অঞ্চলে এই দুই ভাইয়ের বিবাহ বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। অক্ষয়কুমার দত্ত রাজনারায়ণ বসুকে সাধুবাদ জানান। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ হয়। সেই সময় এই বিয়ের প্রবণতা কমে যায়। হুগলীর রামজীবনপুর, চন্দ্রকোনা, ক্ষীরপাই, বাসুলি প্রভৃতি অঞ্চলে বিধবা বিবাহ হতে থাকে। ১২৬৯ সালের ২৪ শে শ্রাবণ বীরসিংহ গ্রামে প্রথম বিধবা বিবাহ হয়। বিধবা বিবাহ প্রচলন করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর প্রচুর অর্থ ব্যয়ও করেছিলেন। এই বিবাহের প্রসার করতে গিয়ে বিদ্যাসাগরকে প্রায় সর্বস্বান্ত হতে হয়, যদিও তাতেও তিনি উদ্যম হারাননি।

বিধবা বিবাহের ব্যাপারে যে সকল ধনীমানী ব্যক্তিদের প্রতিশ্রুতি তিনি পেয়েছিলেন পরবর্তীতে তাঁদের অনেকেই সরে যান। যদিও প্যারীচরণ সরকার প্রভৃতি জনেরা বিদ্যাসাগরের সঙ্গ ত্যাগ করেননি। সমাজের অধিকাংশ উচ্চবর্ণের প্রতিনিধিদের সংস্কার বিমুখতাকে সর্বশক্তি দিয়ে পরাস্ত করতে নেমেছিলেন বিদ্যাসাগর। কিছুটা হলেও উচ্চবর্গীয়দের উন্নাসিকতাকে খর্ব করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ধনী বিধবা কন্যাদের পাত্র জুটলেও দরিদ্র, বয়স্ক, সন্তানসহ বিধবানারীর পাত্র জোটা কঠিন ছিলো, আছে। শহরের প্রগতিশীল অংশের মানুষ এই বিয়েকে স্বীকার করলেও গ্রামজীবনে সহজে এই বিয়ের প্রচলন হয়নি। আর মুসলিম সমাজে বিধবা বিবাহ স্বাভাবিক ছিলো প্রাচীনকাল হতেই। ফলে মুসলিম বা অন্ত্যজ সমাজে এই আন্দোলনের বিশেষ প্রভাব পড়েনি। রামমোহনের সময় হতেই মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার নিয়ে আন্দোলন চলেছে, ১৯৫৬ সালে মৃত স্বামীর সম্পদের অংশীদারের স্বীকৃতিও পেয়েছে মেয়েরা, সংখ্যায় কম হলেও বিধবা বিবাহ হচ্ছে।

বদল ঘটছে সমাজজীবনের

প্রথম বিধবা বিবাহের পর পেরিয়ে এসেছি দেড়শো বছর। প্রাচীন ভারতের সমাজ ছিলো কুপ্রথা ও সংস্কারের জালে বন্ধ। চিন্তা চেতনায় পিছিয়ে ছিলো অশিক্ষার কারণে। ধর্মীয় মোহে ডুবে থাকা জনতাকে জাগানোর হাতিয়ার হিসাবে শাস্ত্রকে বেছে নেন বিদ্যাসাগর। কারণ, যুক্তি দিয়ে বোঝানো সম্ভব হতো না সাধারণ মানুষকে। তাই সুশিক্ষিত হয়েও বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যার ব্যাখ্যা না করে শাস্ত্রীয় নীতি দ্বারা জনতাকে প্রভাবিত করলেন। শাস্ত্র দিয়ে শাস্ত্রকে ভাঙলেন। দেশে ধর্মীয় বিতর্কের জোয়ার তুলে বদল ঘটালেন একটি সাবেকি ভ্রান্ত ধারণার।

মানুষের চেতনার মান উন্নয়নের জন্য চাই শিক্ষা, নিরক্ষরতার অন্ধকারে ডুবে থাকা জনতা নিজের ভালো মন্দ বুঝতে পারেন না সঠিক ভাবে। তাই বিভিন্ন সুবিধাবাদী শক্তি তাদের সহজেই ভুল বোঝাতে সক্ষম হয়। বিদ্যাসাগরের সময় থেকেই বিদেশী শাসকদের প্রচেষ্টায় এখানে আধুনিক শিক্ষার গোড়াপত্তন হয়। কলকাতা মাদ্রাসা কলেজে (১৭৮১), এশিয়াটিক সোসাইটি (১৭৮৪), ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ (১৮০০), হিন্দুকলেজ (১৮১৭), শ্রীরামপুর কলেজ (১৮১৮), সংস্কৃত কলেজ (১৮২৪), স্টটিশচার্চ কলেজ (১৮৩০) প্রভৃতি তৈরির মধ্য দিয়ে আধুনিক শিক্ষার ভিত্তি রচিত হলো, যদিও গ্রামে সাধারণ মানুষ এই শিক্ষার আলো থেকে বহুদূরে ছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার সুযোগ পেয়ে শহরের তরুণ ছাত্রদের একাংশের মধ্যে যুক্তিবাদী উদার ভাবধারা গড়ে ওঠে। নবজাগরণ হয় তাদের মনোজগতে। তাই বিদ্যাসাগরের বিভিন্ন উন্নয়মূলক কর্মসূচিতে

এঁরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগদান করে আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করে। বিধবা বিবাহ যেহেতু ব্যক্তি ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল তাই এই বিবাহ প্রচলনের ক্ষেত্রে সংস্কাবমুক্তি একান্ত প্রয়োজনীয়। সংস্কার মুক্তির জন্য চাই শিক্ষা। স্বাধীনতার ষাট বছর পরেও দেশবাসীর বড়ো একটা অংশ নিরক্ষর। সাক্ষরতার শতকরা হার ১৯৫১ সালে ১৮.৩৩, ১৯৬১ সালে ২৮.৩০, ১৯৭১ সালে ৩৪.৪৫, ১৯৮১ সালে ৪৩.৫৭, ১৯৯১ সালে ৫২.২১ এবং ২০০১ সালে ৬৫.৩৮। ফলে কোটি কোটি নিরক্ষর মানুষ সেইভাবে যুক্তিভাবনা গ্রহণ করার সুযোগ পাননি। অক্ষরজ্ঞানহীন মানুষ আপন বুদ্ধিবলে পরিবেশ থেকে শিক্ষালাভ করে ঠিকই তবে তা অপ্রতুল। মানুষের সুষ্ঠু জীবনযাত্রার জন্য এবং সংস্কারমুক্ত থাকার জন্য তাদের শিক্ষার আলোয় আনা একান্ত আবশ্যক। বিধবা নারীকে বিয়ে না করার অসার যুক্তি, অনেকটা কেটে যাবে শিক্ষার আলোয়। বিধবা বিবাহের প্রশ্নে বিদ্যাসাগর সাথী হিসেবে পেয়েছিলেন শিক্ষিত মানুষকেই। স্বাধীনতার পরে মেয়েরা বাড়ীর চৌকাঠ ডিঙিগয়ে স্কুল কলেজের আঙিনায় প্রবেশ করেছে অধিক সংখ্যায়। ১৮৮৩ সালে কলাকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কাদম্বিনী গাঙ্গুলী প্রথম মহিলা স্নাতক হন। তবে সেই সময় উচ্চশিক্ষায় মেয়েদের যোগদান ছিল অতি অল্প, এবং অবস্থাপন্নরাই এগিয়ে আসতেন। গত ষাট বছরে নারীর সাক্ষরতার শতকরা হার সমগ্র দেশে যথাক্রমে ১৯৫১ সালে ৮.৮৬, ১৯৬১ সালে ১৫.৩৫, ১৯৭১ সালে ২১.৯৭, ১৯৮১ সালে ২৯.৭৬, ১৯৯১ সালে ৩৯.২৯ এবং ২০১১ সালে ৫৪.১৬। অজ্ঞানতার ইত্যাদি ভেবে নিজেকে যন্ত্রণা জালে বিদ্ধ করতো। অন্যান্যদের সাথে নিজেও নিজেকে দোষারোপ করত। ফলে সময়ের আগেই রুগ্ন জীর্ণ হয়ে অবসান হতো জীবনের। পরিস্থিতি বদলাচ্ছে মেয়েরা যুক্তি দিয়ে ক্রমশ সব বিচার বিবেচনা করতে শিখছে। তারা যাতে আরও বেশি করে শিক্ষালয়ে আসে সেদিকে নজর রাখা দরকার।

বিগত বছরগুলিতে বিজ্ঞানের অভাবনীয় অগ্রগতি বদলে দিয়েছে চিকিৎসা ক্ষেত্রকে। জড়িবুটি, তুকতাকের বদলে এসেছে অত্যাধুনিক চিকিৎসা প্রযুক্তি। ১৭০৭ সালে কলকাতায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি হাসপাতাল বানায় বিদেশী বণিক ও সৈনিকদের বাঁচানোর লক্ষ্যে, সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিলো না তাতে। গ্রামগঞ্জের মানুষ ঝাড়ফুঁক তুকতাকের ভরসায় থাকতেন। মহামারীতে শহর গ্রাম উজাড় হয়ে যেতো। সেই সময় বাড়ির কর্তারই ঠিকমতো চিকিৎসা হত না, আর বিধবারা তো অবহেলার পাত্রী ছিলেনই। তাই চিকিৎসাহীন হয়ে মারা পড়েছে বহু অসহায়। অবস্থার বদল ঘটেছে। পর্যাপ্ত না হলেও স্বাস্থ্যকেন্দ্র হাসপাতাল গড়ে উঠেছে দেশ জুড়ে। এরাজ্যে বর্তমানে হাসপাতালের সংখ্যা ৪৩৪, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংখ্যা ১২৬৮, স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র ১০৩৫৪, আয়ুর্বেদ ডিসপেন্সারি ২৯৫, হোমিওপ্যাথি ডিসপেন্সারি ১২২০টি। প্রশিক্ষিত দাই রয়েছেন প্রতিটি গ্রামে। স্বাস্থ্য উপকেন্দ্র, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র, গ্রামীণ হাসপাতাল, মহকুমা হাসপাতাল, জেল হাসপাতাল, স্টেট জেনারেল, মেডিক্যাল কলেজ গড়ে উঠেছে রাজ্য জুড়ে। দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারীরা সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযেগ পান। বিভিন্ন প্রকল্পে নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। একটু সচেতন হলেই এই সুবিধা পাওয়া যায়। ফলে একেবারে চিকিৎসা না পেয়ে মরার ব্যাপারটি নেই। মানুষের গড় আয়ু ৬৪ ছাড়িয়েছে এদেশে। বিধবা নারীরা চিকিৎসা ব্যবস্থার সুফল লাভ করে অকালমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। তবে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে আরও উন্নয়ন দরকার। প্রয়োজন সচেতনতারও।

নানান কারণে বিদ্যাসাগরের সময়কালে দেশের আর্থিক পরিস্থিতি ভালো ছিল না। দারিদ্র্যের অন্ধকালে নিমজ্জিত মানুষ সংসার প্রতিপালনে হিমশিম খেতেন। পরিবারের প্রধান মারা গেলে সংসারে নেমে আসত বিপর্যয়। বিশেষত মহিলারা একান্ত অসহায় অবস্থায় পড়তেন। ১৮৭২ সালের ১৫ই জুন বিদ্যাসাগর হিন্দু ফ্যামিলি আনুইটি ফান্ড তৈরি করেছিলেন বিধবাদের রক্ষার উদ্দেশ্যে। এদেশে জীবনবীমা প্রচলনের অন্যতম রূপকার ছিলেন বিদ্যাসাগর। বর্তমানকালে মেয়েরা পর্দার আড়াল থেকে বিভিন্ন স্থানে চাকুরী করেছেন। পৃথিবীর সমস্ত কর্মক্ষেত্রেই মেয়েদের অবাধ উপস্থিতি। আর্থিকভাবে পরনির্ভরশীলতা ক্রমশ কমছে। ভবিষ্যতে আরও কমবে। বিধবা নারীরা যাতে জীবিকা অর্জনের সুযোগ পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে প্রশাসন ও সাধারণ মানুষকে।

ভারতের মতো দরিদ্র ও পিছিয়ে থাকা দেশে শিক্ষা স্বাস্থ্য জীবিকার পরিসর এখনও সীমিত। দেশের অধিকাংশ মানুষই স্বাচ্ছন্দের বাইরে। স্বাভাবিকভাবেই বিধবা নারীর এই অবস্থা থেকে মুক্ত নন। সমাজের একটা অংশ আজও বিধবাদের অবহেলার দৃষ্টিতে দেখেন। দারুণ উদাসীনতার শিকার হয়ে অনেক বিধবাই ঘর ছাড়েন অথবা পরিবারের মধ্যেই অসহায় জীবনযাপন করতে বাধ্য হন। নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটে চলেছে অহরহ। এর বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার।

সাম্প্রতিক সংবাদ শিরোনামে বিধবা প্রসঙ্গ

২৩শে ফেব্রুয়ারি ২০০০ সালের আনন্দবাজার পত্রিকার 'বাঙালি বিধবা ও এই সমাজ' সম্পাদকীয়তে লেখা হয় 'বাঙালি তথা ভারতীয় সমাজে বিধবা নারীর স্থান ঠিক কোথায়? ইহা ঠিকঠাক ঠাহর করিয়া ওঠা বাস্তবিকই বড়ো দুষ্কর। আপাত দৃষ্টিতে বিধবা মহিলারা বহু ক্লেশে তাঁহাদের বৈধব্যের ভার বহন করেন, সংসার ও বৃহত্তর সমাজে তাঁরা সাধারণভাবে অনাদৃত ও অবহেলিত। সাহায্যের হাত পরিবারের ভিতর অথবা বাহির, যেখানে হইক না কেন তাঁহাদের প্রতি বড় একটা প্রসারিত হইতে দেখা যায় না। অথচ যে সমাজ বিধবাদের উপেক্ষা এবং ঔদাসীন্য অপেক্ষা খুব বেশি কিছু দেয় নাই, সেই সমাজই বৈধব্যকে কাগজে কলমে এক মহীয়সী মর্যাদায় ভূষিত করিয়াছে, সে মর্যাদা বিপন্ন হইলে সমাজের কুলপতিরা রে রে করিয়া ছুটিয়া আসেন। শুধু কুলপতিরা কেন, বৈধব্যের মর্যাদা সম্পর্কে এই ভড়ংটি টিকাইয়া রাখিবার জন্য অনেকেই হিংসার আশ্রয় লইতেও বিন্দুমাত্র পিছপা নন।' চিত্র পরিচালক দীপা মেহতার 'ওয়াটার' ছবিতে বিধবাদের অসহায়ত্বের বর্ণনা থাকায় অনেক ব্যক্তি এর

বিরোধিতা করেন। সংবাদপত্রেও বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়। কাশী, বৃন্দাবন অঞ্চলে প্রচুর বিধবা নারী বসবাস করেন পারিবারিক ঔদাসীন্যের শিকার হয়ে। এই সময় পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যের মহিলা কমিশনের উদ্যোগে ঐ অঞ্চলে বসবাসকারী বিধবাদের বিষয়ে একটি সমীক্ষা করেন। ২৫শে ফেব্রুয়ারি ২০০০ সালে বর্তমান পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'বৃন্দাবনের হাজার দশেক বিধবার হাল ভাল নয়। বৃন্দাবনে বসবাসকারী বাঙালি বিধবাদের জীবনযাত্রা দিনদিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে বলে রাজ্য সরকারের এক রিপোর্টে জানা গেছে।' প্রতিদিন পত্রিকায় (২৫/৩/২০০০) এই জীবনযাত্রা সম্পর্কে বিস্তারিত লেখা হয়। জানা যায় 'পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা, ওড়িশা, এমন কি বাংলাদেশ থেকে ওইসব মহিলাদের ফুঁসলে নিয়ে আসা হচ্ছে। ধনী তীর্থযাত্রীদের ওইসব মহিলাদের সেবাদাসী নামে মনোরঞ্জনের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এদের মধ্যে অনেক অবিবাহিত তরুণীও রয়েছে। অবশ্য এইসব তরুণী তাঁদের সংসার থেকে পরিত্যক্ত। তাই বেঁচে থাকতে বাধ্য হয়েই এদের সেবাদাসীর নামে দেহ ব্যবসার শিকার হতে হচ্ছে। এই তরুণীদের মধ্যে বেশ কিছু অবাঙালিও রয়েছে।' বৃন্দাবনে বিধবা : অন্তর্বর্তী রিপোর্ট পেশ শিরোনামে গণশক্তি পত্রিকায় লেখা হয় (২৫/২/২০০০), 'পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন বৃন্দাবনের বাঙালী বিধবাদের অবস্থা সম্পর্কে যে অর্ন্তবর্তীকালীন সমীক্ষা রিপোর্ট পেশ করেছে তাতে বলা হয়েছে : ১৯৯১ সালের জনগণনা অনুযায়ী বৃন্দাবনে বাঙালী বিধবার সংখ্যা ১০ হাজারের কম। সেখানে বাঙালী বিধবার সংখ্যা ১৬ হাজার আছে বলে যা বলা হচ্ছে তা সঠিক নয়। গত ২০ বছরে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাঙালী বিধবাদের বৃন্দাবনে আসার সংখ্যা অনেক কমে গেছে। বৃন্দাবনে 'ভজনাশ্রমে' বাঙালি বিধবারা ছাড়াও উত্তর প্রদেশ ও অন্যান্য রাজ্য থেকে আসা বিধবারাও জীবনযাপন করেন। ব্যাপক সংখ্যক বিধবা যাঁরা অংশত অর্থনৈতিক এবং অংশত ধর্মীয় কারণে বৃন্দাবনে বসবাস করেছেন তাঁরা ফিরে যেতে ইচ্ছুক নন। সাম্প্রতিক বছরে বৃন্দাবনে বসবাসকারী বিধবাদের জীবনযাপন মানের ক্রমশ অবনতি ঘটেছে কারণ আক্ষরিক অর্থে 'ভজনাশ্রম' ও অন্যান্য দাতব্য সংস্থার কাছ থেকে সহায়তার পরিমাণ অনেক কমে গেছে।' পশ্চিমবঙ্গের সমাজকল্যাণ মন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরীর কাছে রিপোর্ট জমা দেয় পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশন। কালান্তর পত্রিকায় (২৫/২/২০০০) লেখা হয় 'কমিশনের চেয়ারপার্সন বেলা দত্তগুপ্ত এদিন কারা ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরীর কাছে এই রিপোর্ট পেশ করেন। মার্চ মাসের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পেশ হবে বলে কারা ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী এদিন জানান। এই সমীক্ষা পরিচালনার জন্য রাজ্য সরকার ৪ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছে। পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পেশের পর বৃন্দাবনের বিধবা মহিলাদের পুনর্বাসন প্রকল্পের খসড়া করা হবে।' পরবর্তী সময়ে গণশক্তি পত্রিকায় (২২/৪/২০০০) সহায় সম্বলহীন বিধবা কন্যার পিতা মাতার সম্পত্তির অধিকার সম্বন্ধে বিস্তারিত লেখা লেখে। 'সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে সহায় সম্বলহীন বিধবা কন্যা তাঁর পিতা-মাতার কাছে ভরণপোষণ দাবি করতে পারেন। হিন্দু সম্পত্তি আইনের ধারা ব্যাখ্যা করে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি এম. বি. মজুমদার এবং বিচারপতি এম. জে. রাও রায় দিয়েছেন, যদি স্বামীর মৃত্যুর পরে বিধবা কন্যার স্বামীর সম্পদ না থাকে বা নিজেরও জীবনযাপন করার সামর্থ্য না থাকলে তাহলে তিনি নিজের পিতা এবং মাতার কাছে ভরণপোষণ দাবী করতে পারেন। পিতার জীবনকালের মতো পিতার মৃত্যুর পরেও এই অধিকার স্বাভাবিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি পাবে।' রাজ্য মহিলা কমিশন ও কেন্দ্রীয় সরকারের ৩ সদস্যের প্রতিনিধি দল বৃন্দাবন কাশীর বিধাবাদের অবস্থান দেখে সমীক্ষা রিপোর্ট জমা দেয় রাজ্য সরকারের কাছে। এর সূত্র ধরে আজকাল পত্রিকায় বেরোয় (২৭/৬/২০০১) 'কাশীর বিধবারা চাইলে তাঁদের ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করবে রাজ্য সরকার। রাজ্যের বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে উদ্যোগ নিয়ে বিধবাদের রাখার ব্যবস্থা করা হবে। মঙ্গলবার বিধানসমায় একথা জানান রাজ্যের কারা ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী।' রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে বিধবা মহিলাদের কিছু কিছু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হচ্ছে।

উপরোক্ত সংবাদগুলি থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার যে বিধবা মহিলারা আজও অবহেলা বঞ্চনার শিকার। তাদের যন্ত্রণা জাল থেকে মুক্তি দিতে গড়ে তুলতে হবে জন সচেতনতা, সামাজিক আন্দোলন। নারী মুক্তির লক্ষ্যে বিদ্যাসাগরের দেখানো পথে এগিয়ে চলতে হবে। সুনিশ্চিত করতে হবে নারী শিক্ষা, স্বনির্ভরতা, স্বাস্থ্য সুবিধা এবং নিরাপত্তা দান। মুক্তি ঘটাতে হবে যাবতীয় কুসংস্কারের।

তথ্যসূত্র

১। অমিয় কুমার সামন্ত - বিদ্যাসাগর
২। ইন্দ্র মিত্র - করুণাসাগর বিদ্যাসাগর
৩। বিদ্যাসাগর রচনাবলী
৪। বিনয় ঘোষ - বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ
৫। বিহারীলাল সরকার - বিদ্যাসাগর
৬। মণিদীপা ঘোষ - বিধবা বিবাহ আন্দোলন : বাংলা কবিতা ও নাটক (প্রবন্ধ)
৭। শশিভূষণ বসু - রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী
৮। শিবনাথ শাস্ত্রী - রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ